বর্ষ ৫ সংখ্যা ৫ নভেম্বর ২০১৮

প্রান্তজন

ইউরোপীয় ইউনিয়ন-এর মানবাধিকার ও গণতন্ত্র সনদ (ইআইডিএইচআর)-এর অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পের আওতায় সেড প্রকাশিত বার্ষিক নিউজলেটার

সূচি

কাউকে পেছনে ফেলে নয়

প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর বন, ভূমি ও সামাজিক অধিকার-বিষয়ক সম্মেলন

চা শ্রমিকের প্রতি সাহায্যের হাত

প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালার খবর

চা বাগানে নির্বাচন এবং চা বাগানের বাধা শ্রমিকদের আরো গুরুতর বিষয়

গবেষণা এবং জরিপ: আদিবাসী, হরিজন, বেদে, যৌনকর্মী, বিহারি, ঋষি এবং টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর শালবন এলাকার গ্রামসমূহের উপর খানা জরিপ

পোস্টার

সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৮: অনুষ্ঠানসূচি

সম্পাদক
ফিলিপ গাইন

সম্পাদনা সহকারী
সাবরিনা মিতি গাইন ও রবিউল্লাহ

পৃষ্ঠাসজ্জা সহকারী
বর্ষা চিরান ও প্রসাদ সরকার

উপদেষ্টা
ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, মোয়াজ্জেম হোসেন, জয়ন্ত অধিকারী, সিলভেস্টার হালদার এবং ভূপেশ রায়

এ নিউজলেটার প্রকাশিত হয়েছে "বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সংজ্ঞায়ন, তাদের বর্তমান অবস্থার চিত্রায়ণ এবং তাদের সক্ষমতা ও যোগাযোগ বৃদ্ধি" প্রকল্পের আওতায়।

প্রকাশক
সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)
গ্রীন ভ্যালী, ১৪৭/১ গ্রীন রোড, (৩য় তলা), ফ্ল্যাট নং. ২এ, ঢাকা-১২১৫, ফোন:+৮৮০-২-৫৮১৫৩৮৪৬
ই-মেইল: sehd@sehd.org, www.sehd.org

কাউকে পেছনে ফেলে নয়

প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর বন, ভূমি ও সামাজিক অধিকার-বিষয়ক সম্মেলন

সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় ওঁরাও দলের নৃত্য পরিবেশন। ছবি: ফিলিপ গাইন

বাংলাদেশে প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন মানুষের সংখ্যা ৮০ লাখের মতো। এদের একটি বড় অংশ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে। দেশে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হচ্ছে বটে, তবে প্রান্তিকতা ও বিচ্ছিন্নতার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বিশেষত সমতলের আদিবাসী এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠী।

প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী যেমন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, হরিজন, বেদে, জলদাস, কায়পুত্র, ঋষি, যৌনকর্মী, বিহারী অন্যান্য ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত নানা ধরনের বিচ্ছিন্নতা ও দারিদ্র্যের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি এবং ধর্মের চাপে এ জনগোষ্ঠীর মানুষ তাদের নিজস্বতা, ভাষা, সংস্কৃতি এবং বন ও ভূমির উপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নানা প্রতিকূলতার মুখে পড়ছে। একইভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক সুরক্ষা অর্জনও তাদের জন্য কষ্টকর।

এ জনগোষ্ঠীগুলোর সমস্যার মধ্যে যেমন অনেক সাযুজ্য আছে তেমনি আবার অনেক পার্থক্যও আছে। সাঁওতাল, গারো এবং ওরাঁওদের মতো অনেকগুলো আদিবাসী জনগোষ্ঠী বন ও ভূমিতে তাদের ঐতিহ্যগত অধিকার থেকে বঞ্চিত। বনাঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসীদের বনভূমি ব্যবহারের ঐতিহ্যগত অধিকার পৃথিবীর নানান দেশে স্বীকৃত। কিন্তু বাংলাদেশে এখন এমন অনেক অধিবাসী আছে যারা বনভূমির আদিবাসিন্দা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই ভূমিতে তাদের কোনো অধিকারের স্বীকৃতি নেই। চা জনগোষ্ঠী, হরিজন, বেদে, যৌনকর্মী এবং জলদাসদের মতো কিছু জনগোষ্ঠী সম্পূর্ণভাবে ভূমিহীন। তবে কেউ কেউ খুব সামান্য পরিমাণ জমিতে চাষের অধিকার পায়। এদের অনেকেই আবার বাঙালি প্রতিবেশীদের দ্বারা ভূমি দখল, শারীরিক নির্যাতন, খুন এবং ধর্ষণের শিকার হয়। এইসব অন্যায়-অনিয়ম বন

এ প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে দি ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ইকো কোঅপারেশন। এ প্রকাশনায় যেসব দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত প্রকাশিত হয়েছে তা আবশ্যিকভাবে দি ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ইকো কোঅপারেশন-এর নয়।

ও ভূমির উপর বনবাসীর অধিকার খর্ব করছে এবং এর ফলে প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন মানুষগুলোর দারিদ্র্য বংশ পরম্পরা ধরে অব্যাহত থাকছে।

এমন একটি পটভূমিতে, ১৬-১৭ নভেম্বর ২০১৭ সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন সেন্টার (পিপিআরসি), খ্রিস্টিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (সিসিডিবি) এবং গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)–এ চারটি প্রতিষ্ঠান প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন মানুষের চ্যালেঞ্জগুলো রংপুরে সম্মেলনের মাধ্যমে সবার সামনে তুলে ধরেছে। সম্মেলনটি ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ইকো কো-অপারেশনের আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত সাড়ে তিন বছরের প্রকল্পে অংশ হিসেবে আয়োজন করা হয়। সাড়ে তিন বছরের প্রকল্পের সময় অনুষ্ঠেয় তিনটি সম্মেলনের প্রথমটির মূল বিষয় ছিল বন ও ভূমির অধিকার এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সুরক্ষার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। আয়োজকরা তাদের গবেষণা এবং অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের সাথে বিনিময় করে। সম্মেলনে ২০-এর অধিক জাতিগোষ্ঠী ও দল এবং ৬০-এর অধিক সুশীল সমাজ, সামাজিক প্রতিষ্ঠান (সিবিও) ও সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধিদের নিজেদের বঞ্চনা বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের নানা অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। সেইসাথে তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যে হারিয়ে যেতে বসেছে সেগুলো নিয়েও তারা আলোচনা করেন।

বহুমুখি বঞ্চনার উন্মোচন

সম্মেলনে গবেষণালব্ধ তথ্য-বিশ্লষণ, প্রতিবেদন ও সাক্ষ্য প্রমাণ বঞ্চনার শিকার আদিবাসী এবং অন্যান্য বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর নিত্যদিনের অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান হয়। সেড-এর পরিচালক ফিলিপ গাইন তার মূল প্রবন্ধে যেসব জনগোষ্ঠী এখনও বনভূমিতে বাস করছে বনের উপর তাদের অধিকারহীনতার কথা তুলে ধরেন। অরণ্যচারী মানুষ আজ বন বিভাগের সাথে বিবাদে নামতে বাধ্য হচ্ছে। গারো, সাঁওতাল, ওরাঁওসহ অনেক জাতিগোষ্ঠীর মানুষ বন বিভাগ তৈরির বহু আগে থেকেই বনে বাস করে আসছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে শুরু হয় অরণ্যের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ। ব্রিটিশ শাসকেরা বন সংরক্ষণের যে প্রক্রিয়া শুরু করে তা অরণ্যচারী মানুষের দৃষ্টিতে অনৈতিক। ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটলেও পরবর্তীতে রাষ্ট্র নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান তৈরি করে যা বন সংরক্ষণ প্রক্রিয়া এবং বনসম্পদ বাণিজ্যিকভাবে আহরণ অব্যাহত রাখে।

সম্মেলনে উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতির বক্তব্য দিচ্ছেন ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। ছবি: প্রসাদ সরকার

মধুপুর শাল বনের গারো ও কোচদের স্থানীয় প্রধান সংগঠনের সভাপতি ইউজিন নকরেক (গারো সম্প্রদায়ভুক্ত) বন বিভাগ কর্তৃক তাদের উপর নির্যাতনের বর্ণনা দেন। "২০১৬ সালে ৯,১৪৫.০৭ একর জমি নতুন করে সংরক্ষিত ঘোষণা করায় সাত হাজার আদিবাসী উচ্ছেদ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে।" ইউজিন নকরেক অভিযোগ করেন যে প্রক্রিয়ায় বন সংরক্ষণ করা হচ্ছে তা তাদের না জানিয়ে, যা সম্পূর্ণভাবে আইন বহির্ভূত। মধুপুরে প্রাকৃতিক বন ব্যাপকভাবে ধ্বংস করে কীভাবে বনায়ন প্রকল্প চলছে তার বিস্তারিত বর্ণনা দেন তিনি ।

উত্তরবঙ্গভিত্তিক সংগঠন জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন ইউজিন নকরেকের সাথে ঐক্যমত পোষণ করে জানান নানা রকম বনায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে কীভাবে রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের প্রাকৃতিক শাল বন ধ্বংস করা হয়েছে। তিনি উত্তরবঙ্গের আদিবাসীরা কীভাবে ক্রমাগত ভূমি দখল এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে ভূমি অধিগ্রহণের শিকার তার বিশদ বর্ণনা দেন। "ভূমি দস্যুরা জমি দখলের জন্য আদিবাসীদের ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, তাদের হত্যা করেছে এবং নারীদের ধর্ষণ করেছে। প্রভাবশালী মহল, রাজনৈতিক নেতা এবং এমনকি রাষ্ট্রীয় সংস্থা তাদেরকে ভূমিহীন বানাচ্ছে। নিরাপত্তাহীনতার কারণে বহু আদিবাসী দেশত্যাগে বাধ্য হচ্ছে," বলেন সরেন।

সম্মেলনে বিভিন্ন জেলা থেকে নিগ্রহের শিকার আদিবাসী, হরিজন, যৌনকর্মী, বেদে এবং বিহারী জনগোষ্ঠীর বেশকিছু নারী-পুরুষ প্রতিনিধি অংশ নিয়ে বর্ণনা করেন তাদের নানা হৃদয়বিদারক কাহিনী।

হরিজনদের সামাজিক জীবনে অমানবিক আচরণ নিত্য সঙ্গী। এ বিষয়ে রংপুর হরিজন ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক কালু বাঁশফোর তার জীবনের বঞ্চনা ও অমানবিক আচরণের কথা তুলে ধরেন। "আমাদের অফিসের সবাই অফিসের বার্ষিক বনভোজনে গেছে, শুধু আমি ছাড়া। কারণ আমার সহকর্মীরা একজন সুইপারের পাশে বসে খেতে রাজি নয়। এ ঘটনায় আমি ভীষণ অপমানিত বোধ করেছি," বলেন কালু বাঁশফোর।

ভাষা সৈনিক এবং রংপুর শহরের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব মোহম্মদ আফজাল যিনি আদিবাসী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে যথেষ্ট ধারণা রাখেন তিনি এসব বঞ্চনার ঘটনা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি জানান, "স্বাধীনতার সময় আমাদের স্বপ্ন ছিল প্রতিটি নাগরিকের জন্য সমান অধিকার। কিন্তু আমাদের সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। আদিবাসীরা তাদের অধিকার এবং কর্মক্ষেত্র থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তারা প্রতিনিয়ত বঞ্চনা এবং ঘর ও জমি থেকে উচ্ছেদের শিকার হচ্ছে। এমনকি সরকারও তাদের জমি নিয়ে নিচ্ছে।"

গবেষক ও সাহিত্যিক ড. হরিশংকর জলদাস চট্টগ্রাম থেকে সম্মেলনে যোগ দিতে আসেন। তিনি জলদাসদের বাসস্থানগত ও সমাজে তাদের অবস্থানগত সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তাদের বাদ দিয়ে সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয় বলে তিনি বিশ্বাস করেন। "যদি বাঙালি সমাজকে একটি স্মৃতিস্তম্ভের সাথে তুলনা করা হয় তাহলে তা দাঁড়িয়ে আছে বঞ্চিত ও প্রান্তিক মানুষের উপর। এ সমাজ বিনির্মাণে তাদের অবদান যথেষ্ট কিন্তু তারা প্রতিনিয়ত অবহেলিত," বলেন হরিশংকর জলদাস। জলদাস সমাজের মানুষ হওয়াতে তাকে জীবনে

নানা নিগ্রহের মুখোমুখি হতে হয়েছে। তিনি বলেন, "এ অবস্থা থেকে উত্তরণের প্রধান উপায় হলো শিক্ষা। একজন আদিবাসী, বেদে এবং হরিজন শিক্ষিত হলে তার অধিকার সম্পর্কে সোচ্চার হতে পারে।"

"প্রান্তিকতা একটি বাস্তবতা এবং এই প্রান্তিকতার কারণে একদল মানুষকে বঞ্চিত করা অপরাধ,' বলেন বাংলাদেশে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি নুরুল কাদের।" কাউকে পেছনে ফেলে নয়–এসডিজি'র এই অন্যতম লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন কাজ করে চলেছে বলে জানান তিনি। তিনি আরো জানান যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভূমি জরিপের একটি পাইলট প্রকল্প শুরু করেছে যা ভবিষ্যতে বাংলাদেশে একটি ভূমি নীতি গঠনে সহায়ক হবে। "বাংলাদেশে ভূমি, বন এবং মৎস্য সম্পদ ব্যবহারের কোনো পৃথক নীতিমালা নেই। যদি এখানে একটি জাতীয় ভূমিনীতি থাকতো তাহলে ভূমি ব্যবহারের বৈষম্য বন্ধ করা সম্ভব হতো। আমরা বাংলাদেশ সরকারের কাছে একটি খসড়া ভূমিনীতি জমা দিয়েছি, এটি পূর্ণাঙ্গ হলে মানুষ এর ফলে উপকৃত হবে," বলেন নুরুল কাদের।

বিশিষ্ট গবেষক এবং উদ্বোধনী পর্বের সভাপতি ড. হোসেন জিল্লুর রহমান প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন মানুষের শিক্ষা, বাসস্থান, কাজ, ভূমি, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে আলোচনা করেন। "শুধু দারিদ্র্য দূরিকরণ নয়, আদিবাসী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাদের সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়ের স্বীকৃতি চায়," বলেন ড. রহমান। "প্রতিটি জনগোষ্ঠীর আলাদা আলাদা সমস্যা আছে। কিন্তু প্রান্তিকতার সমস্যা প্রতিটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে রাখে। প্রান্তিকতার প্রধান দুটি কারণ হলো সমান সুযোগের অভাব এবং তাদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। সাধারণ দারিদ্র্য দূরীকরণ কৌশল দিয়ে প্রান্তিকতার সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ।"

"এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক সুরক্ষার বিষয়টি রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব যারা সরকারে থাকেন তাদের সদিচ্ছার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। কিন্তু এসব বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা সমাজের বৃহত্তর সাধারণ জনগণের উপর নির্ভর করে। যদি সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এইসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমান মর্যাদা ও অধিকারের জন্য সঠিক ভূমিকা পালন করে তাহলে রাজনৈতিক সুরক্ষা অর্জন সহজ হবে," বলেন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকারী ফিলিপ গাইন।

সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে আরো বক্তব্য রাখেন মোয়াজ্জেম হোসেন, ড. তানজিমুদ্দীন খান, ড. মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদ, ভূপেশ রায় এবং হারুন-উর-রশিদসহ আরো অনেকে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠের দেশ হলেও বাংলাদেশে আদিবাসী, চা শ্রমিক ও হরিজন সম্প্রদায়ের অন্তত ১১৫টি জনগোষ্ঠী রয়েছে। এসব জনগোষ্ঠীর মানুষ বাংলা ছাড়া অন্তত ৪০টি ভাষায় কথা বলে। তাদের ভাষা, শিক্ষা, নিজস্ব জ্ঞান ও দক্ষতা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ইতিহাস ও খাদ্যাভ্যাসের বৈচিত্র্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।

সাঁওতাল, মুশোহর, ওরাঁও, গারো, মাহলে, কোরা ও তুরি জাতিগোষ্ঠীর নয়টি সাংস্কৃতিক দল সম্মেলনের দুইদিনই সন্ধ্যায় তাদের ঐতিহ্যবাহী গান ও নাচ পরিবেশন করে। সাংস্কৃতিক দলগুলোর সদস্যদের বিশেষত্ব হচ্ছে তাদের অধিকাংশই পেশায় কৃষক, দিনমজুর, গৃহিণী, কুলি ও শিক্ষার্থী। তারা নিজস্ব ঢোল, বাঁশি, পোশাক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক উপকরণ নিয়ে হাজির হন। ঐতিহ্যবাহী এসব বাদ্যযন্ত্রের পরিবেশনা সম্মেলন স্থানে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি করে। বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে অংশগ্রহণকারীরা নাচ ও গান পরিবেশন করেন।

সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল বাংলাদেশে ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ক বক্তৃতা। বাঙালি নয় এমন আদিবাসী ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মানুষের সাংস্কৃতিক জগত ছিল বক্তৃতার বিষয়। ১৬ নভেম্বর সন্ধ্যায় দিনাজপুর সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মাসুদুল হকের আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে দেয়া বক্তব্য দর্শকদের চমৎকৃত করে। তিনি তার আলোচনায় বাঙালি ও আদিবাসী সংস্কৃতির মধ্যকার সম্পর্কের উপর জোর দেন। তিনি বলেন, "বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা থেকে বাংলা ভাষা অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে। বাঙালি সংস্কৃতিও অন্যান্য সংস্কৃতির কাছে ঋণী।" তিনি আরো বলেন,"তবে দুঃখের বিষয় বাঙালি নয় এমন আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এখনও তাদের নিজস্ব ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধরে রাখলেও তারা সুবিধাবঞ্চিতই থেকে গেছেন।"

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর পরিচিতি ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত করতে যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয় তা নিয়ে আলোচনা করেন রংপুরের কাউনিয়া কলেজের অধ্যাপক ড. শ্বাশত ভট্টাচার্য্য। জীবন, সংগ্রাম ও রাজনীতির সাথে সংস্কৃতি কীভাবে জড়িয়ে আছে সেদিকে আলোকপাত করেন তিনি। বলেন, "আমাদের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রধান সমস্যা ভূমিহীনতা। তাদের অধিকারে থাকা সামান্য ভূমিও তারা ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছে যা তাদের সংস্কৃতি ও ভাষাকে হুমকির মুখে ফেলে দিচ্ছে।" তিনি আরো বলেন, "রাজনীতি আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও অস্তিত্ব সুরক্ষার সাথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে সম্পর্কিত। রাজনৈতিক মতাদর্শের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে আমাদের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম এবং রাষ্ট্রভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা বাংলাদেশের অন্যান্য ভাষা ও সংস্কৃতির জন্য হুমকিস্বরূপ।"

করণীয়

প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবন, ভাষা ও সংস্কৃতির নিরাপত্তার অভাব বিবেচনা করে সম্মেলনে বক্তা ও অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন পরামর্শ তুলে ধরেন। সব জাতিগোষ্ঠীকে সংজ্ঞায়ন, তাদের দৃশ্যমান করতে ও তাদের নির্ভুল পরিসংখ্যান তুলে ধরতে প্রতিটি নৃ-গোষ্ঠীর পরিচিতি তুলে ধরা জরুরি এমন পরামর্শ বক্তাদের। সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকারীর তথ্য অনুসারে সরকারি হিসাব মতে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সংখ্যা ২৭। তবে সেড-এর গবেষণায় ১১০টির মতো জাতিগোষ্ঠীর খোঁজ পাওয়া গেছে (হরিজন ছাড়া)।

এসব জনগোষ্ঠীর প্রতিটির আলাদা নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, বিশ্বাস, ভাষা ও সংস্কৃতি আছে। এদের পরিচিতি তুলে ধরতে বিদ্যমান আইনে তাদের সম্পর্কে কী আছে তা জানা, এর প্রাসঙ্গিকতা যাচাই ও আরো কী প্রয়োজন তা বের করা দরকার। আত্মপরিচয় তুলে ধরতে ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি যত্নেবান হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়া (পরিসংখ্যান, আইন ও নিরাপত্তা জাল কর্মসূচি) থেকে সুবিধা নেয়ার বিষয়েও পরামর্শ দেন অনেকে। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও তাদের সমস্যা বিষয়ে সচেতন করে তুলতে সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার পরামর্শও আসে। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষকে প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী সম্পর্কে তথ্য ও পরামর্শ দিতে একটি ন্যাশনাল রিসোর্স সেন্টার গড়ে তোলার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে বলে জানান সম্মেলনের আয়োজকরা।

রিপোর্ট: ফিলিপ গাইন, দেবু মল্লিক, সৈয়দা আমিরুন নূজহাত এবং রওনক জাহান। ❑

চা শ্রমিকের প্রতি সাহায্যের হাত

ডা. সত্যকাম চক্রবর্তী সাথে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা। ছবি: সঞ্জয় কৈরী

চা শ্রমিক ও তাদের জাতিগোষ্ঠীসমূহ সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন। চা শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে শ্রম আইনে যা উল্লেখ আছে তা বাস্তবে কার্যকর নয়। জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষার হার থেকে তুলনামূলকভাবে অনেক পিছিয়ে চা শ্রমিকদের সন্তানেরা। স্বল্প আয়ের এ জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষ অপুষ্টির শিকার। তাদের বাসগৃহের অবস্থা খুবই নাজুক। চাইলেও এরা জমির মালিক হতে পারেনা। এছাড়া আরো উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে চা বাগানে বসবাসকারী এসব জাতিগোষ্ঠী (চা বাগানে প্রায় ৮০টির মতো জাতিগোষ্ঠী পাওয়া গেছে) সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত নয় এবং তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি এখন হুমকির মুখে। এসবই হচ্ছে চা জনগোষ্ঠীর মানুষদের বাস্তব অবস্থা এবং এর ফলে জনগোষ্ঠী হিসেবে তারা এখনো মূলধারার মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন এবং 'বাধা' পড়ে আছে চা বাগানের লেবার লাইনে।

চা জনগোষ্ঠীর এসব সমস্যা গত ১৮-২০ ডিসেম্বর ২০১৭ শ্রীমঙ্গলে অনুষ্ঠিত একটি কর্মশালায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ কর্মশালার শিখন উদ্দেশ্য ছিল চা শ্রমিকদের সার্বিক অবস্থা ও আইন কাঠামোয় তাদের সুরক্ষা নিয়ে বিশ্লেষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং চা শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী ট্রেড ইউনিয়ন ও পঞ্চায়েত নেতৃবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধি। সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) এ কর্মশালার আয়োজন করে। সাতটি ভ্যালির শ্রমিক নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন পঞ্চায়েতের ২১ জন প্রতিনিধি কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালার শুরুতে সেড-এর পরিচালক ফিলিপ গাইন বাংলাদেশের চা জনগোষ্ঠীর সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন। তিনি চা জনগোষ্ঠীর উপর সেড-এর গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরে জানান, বাংলাদেশের চা বাগানগুলোতে প্রায় ৮০টি গোষ্ঠী আছে যারা চা বাগানের বাইরে অপরিচিত। তিনি সেড প্রকাশিত (২০১৬ সাল) চা শ্রমিক, চা জনগোষ্ঠী এবং চা শিল্প সম্পর্কে তথ্যবহুল বই 'স্লেভস ইন দিজ টাইমস: টি কমিউনিটিজ অব বাংলাদেশ'-এর কথা কর্মশালায় উল্লেখ করেন।

এ বইটির সম্পাদক ফিলিপ গাইন বলেন, "চা জনগোষ্ঠীর মানুষেরা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে এবং তাদের রয়েছে বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যা বর্তমানে হুমকির মুখে। এসব জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা করা আবশ্যক। সঠিকভাবে চর্চার অভাবে এক সময় তাদের ভাষা হারিয়ে যেতে পারে এবং বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে তাদের সংস্কৃতি। কোনো জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি যদি যথাযথভাবে সুরক্ষা না করা হয় তাহলে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা খুবই কঠিন হয়ে যায়।"

শ্রীমঙ্গল উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো: জয়নাল আবেদীন টিটো চা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং চা শ্রমিকেরা কীভাবে সরকারি হাসপাতালে প্রদেয় স্বাস্থ্যসুবিধা পেতে পারেন সে সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করেন। "চা বাগানে ডায়রিয়া, রক্তস্বল্পতা, নিউমোনিয়া, কুষ্ঠব্যাধি, যক্ষা, সার্ভিক্যাল ক্যান্সার ইত্যাদি রোগের প্রকোপ খুব বেশি পরিলক্ষিত হয়। জাতীয় পর্যায় থেকেও তুলনামূলকভাবে চা শ্রমিকদের এসব রোগে আক্রান্ত হওয়ার হার অনেক বেশি," বলেন ডা. মো: জয়নাল আবেদীন। "চা জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিরাজমান এসব দূরবস্থার প্রধান কারণ তাদের অতি স্বল্প মজুরি।"

চা জনগোষ্ঠীর মানুষের জন্য সরকারি স্বাস্থ্যসুবিধা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে ডা: আবেদীন কর্মশালায় কথা বলেন। "চা জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা সেবায় কোম্পানির ডিসপেনসারির অবস্থা ভালো নয়। আমরা চা বাগানে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করতে চাই, কিন্তু জমির অভাবে তা সম্ভব হয়ে উঠছে না অনেক জায়গায়। চা বাগানের সব জমির (১১৩,৬৬৩.৮৭ হেক্টর) মালিক সরকার হলেও এসব জমি চা উৎপাদনের জন্য লিজ দেওয়া।" বলেন ডা. আবেদীন।

"চা জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা বৃদ্ধিতে কোম্পানির ডিসপেনসারি ব্যবস্থাকে আরো উন্নত করতে হবে এবং সেখানে দক্ষ ডাক্তার এবং নার্স নিয়োগ দিতে হবে। এ নিয়ে আমরা চা বাগানের মালিকদের সাথে কাজ করতে প্রস্তুত জানান।" বলেন ডা. আবেদীন।

মৌলভীবাজার জেলার সিভিল সার্জন ডা. সত্যকাম চক্রবর্তী কর্মশালায় চা জনগোষ্ঠীর নাজুক স্বাস্থ্য অবস্থা এবং চা শ্রমিকেরা কীভাবে আরো সহজে সবার জন্য সরকারি স্বাস্থ্যসেবা পেতে পারে সে বিষয়ে তার গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও বিশ্লেষণ তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, "চা বাগানে বিরাজমান বিভিন্ন দূরবস্থার কারণেই মূলত সেখানে স্বাস্থ্যসুবিধা ব্যবস্থা যথেষ্ট কার্যকর নয়। ফলে চা বাগানে মাতৃমৃত্যুর হার বেশি এবং ১০০ ভাগ ভ্যাকসিনেশনের আওতায় থাকার পরও চা বাগানে শিশুমৃত্যুর হার অনেক বেশি।"

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সাবেক উপ-মহাপরিদর্শক মো: আজিজুল ইসলাম শ্রম আইনে চা শ্রমিকদের যেসব অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা আছে সেগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন। ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের শ্রম আইন সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক বলে তিনি মনে করেন।

তিনি চা শ্রমিকদের এ বিষয়ে পরামর্শ দিতে গিয়ে বলেন, "চা শ্রমিকেরা যদি মালিকদের সাথে সৃষ্ট কোনো দ্বন্দ্ব বা বিরোধ আপসে মীমাংসা করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তারা নির্ধারিত আদালতে মামলা করতে পারবে। বাংলাদেশে সাতটি শ্রম আদালত আছে। কিন্তু চা শ্রমিকেরা শুধুমাত্র চট্টগ্রাম বিভাগীয় দ্বিতীয়

শ্রম আদালতে মামলা দায়ের করতে পারে। যদি কোনো শ্রমিক শ্রম আদালতে মামলা করেন তাহলে তার নিয়োগদাতাকে অবশ্যই আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আদালতে হাজির হতে হবে। শ্রম আদালতে দায়েরকৃত মামলার রায় যদি শ্রমিকের বিপক্ষে যায় তাহলে রায় চ্যালেঞ্জ করে তারা শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল করতে পারবে।"

উন্নয়ন পরামর্শক হারুন-অর-রশিদ সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন এবং সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সমন্বিত প্রচেষ্টার গুরুত্ব বিষয়ে কর্মশালায় আলোচনা করেন। "সংগঠন পরিচালনায় সঠিক ও যোগ্য নেতৃত্ব, নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপন, সম্পদ, নীতিমালা, পরিকল্পনা এবং কার্যপ্রণালী বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" বলেন হারুন-অর-রশিদ।

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন (বিসিএসইউ)-এর সাধারণ সম্পাদক রামভজন কৈরী বলেন, "চা শ্রমিকদের এতোসব সমস্যার মূল কারণ তাদের স্বল্প মজুরি (চা শ্রমিকদের বর্তমান দৈনক নগদ মজুরি ১০২ টাকা)।" কৈরী বলেন, "আয়স্বল্পতার কারণে আমরা আমাদের সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ জোগাতে পারিনা। শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের সন্তানেরা অন্যান্যদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না এবং আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে পারিনা বললেই চলে।"

শ্রম আইন ব্যখ্যা করে রামভজন কৈরী বলেন, চা শ্রমিক সম্পর্কে শ্রম আইনে যেসব ধারা রয়েছে তার অনেকগুলো বৈষম্যমূলক অন্যদিকে এবং এ আইন চা শ্রমিকদেরকে যেসব অধিকার পাবার নিশ্চয়তা দেয় সেগুলোও ক্ষুণ্ন করছে মালিকেরা। "মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ টি অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএ) এবং বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন (বিসিএসইউ)-এর মধ্যে ২০১৬ সালে সম্পাদিত চুক্তিতে চা শ্রমিকদেরকে গ্রাচুইটি প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হলেও চা শ্রমিকদেরকে কখনোই গ্রাচ্যুইটি দেয়া হয়নি," অভিযোগ কৈরীর।

"চা বাগানে কোনো নিরাপত্তা কমিটি বা কল্যাণ কর্মকর্তা নেই, অথচ শ্রম বিধিমালা ২০১৫-তে বাগানে কল্যাণ কর্মকর্তা থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর চাইতে আরও গুরুতর বিষয় হচ্ছে শ্রম আইনে অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জন্য নিত্য-নৈমিত্তিক ছুটির ব্যবস্থা থাকলেও আমাদের ক্ষেত্রে এ সুবিধা দেয়া হয়নি," জানান কৈরী।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা দুটি দলে ভাগ হয়ে মৌলভীবাজার জেলায় অবস্থিত মাজদিহি চা বাগান এবং মৌলভী চা বাগান পরিদর্শন করেন। তারা সেখানে বসবাসকারী শ্রমিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন। অংশগ্রহণকারীরা বাগান দুটোর পঞ্চায়েত সদস্য এবং সাধারণ চা শ্রমিকদের সাথে আলোচনা করেন।

মৌলভী চা বাগান পরিদর্শনকারী দলটি বাগান পরিদর্শন শেষে জানান, মৌলভী চা বাগান 'বি' শ্রেণীভুক্ত একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন বাগান। এ বাগানের মালিক এখানকার শ্রমিকদের কল্যাণের বিষয়ে খুব কমই নজর দেন। এখানে নেই কোনো নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা। বাগানের পয়ঃনিষ্কাশন এবং বাসস্থানের অবস্থা খুবই নাজুক এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক স্কুল না থাকায় এখানকার শিশুরা শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে।

অন্যদিকে মাজদিহি চা বাগানে পরিদর্শনে যাওয়া দলটি জানান, স্টারলিং বা ব্রিটিশ কোম্পানী ডানকান ব্রাদার্স-এর মালিকানাধীন 'এ' শ্রেণীভুক্ত মাজদিহি চা বাগানের অবস্থা অন্যান্য বাগান থেকে ভালো। এ বাগানে পর্যাপ্ত সংখ্যক স্কুল থাকায় এখানকার শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করতে পারছে (একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ এ বাগানে মোট ১৩টি স্কুল আছে)। তবে, এখানে কোনো মাধ্যমিক বা হাই স্কুল না থাকায় উর্ধ্বতন (প্রাথমিক শিক্ষার উপরে) শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক অনেক শিক্ষার্থী আর পড়তে পারেনা। এ বাগানে একটি ডিসপেনসারি আছে যেখান থেকে শ্রমিকদেরকে কিছু মৌলিক চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়। কিন্তু মুমূর্ষু রোগীদেরকে জরুরী চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য এখানে নেই কোনো অ্যাম্বুলেন্স সুবিধা।

অংশগ্রহণকারীরা পরিদর্শনকৃত দুটি বাগানের পরিচিতির মূল্যায়ন অংশও হালনাগাদ করেন। চা বাগান পরিদর্শনে যাওয়া এসব দলের সংগৃহীত যাবতীয় তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে সেড নিয়মিতভাবে প্রত্যেক চা বাগানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি-শীর্ষক যে গবেষণার কাজ করে যাচ্ছে সেটিরও হালনাগাদ করছে। আর এসব তথ্য-উপাত্ত একসাথে করে প্রকাশ করা হবে চা বাগানের উপর একটি বই এবং তৈরি হবে চা বাগানের উপর ওয়েব পোর্টাল। *ফিলিপ গাইন এবং রওনক জাহান।* ❑

প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালার আরো খবর

মধুপুর শালবন এলাকার গ্রামসমূহের উপর জরিপ নিয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ

১৬-১৮ মে ২০১৭ টাঙ্গাইলের মধুপুরে অনুষ্ঠিত তিনদিনব্যাপী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন ৩০ জন তরুণ মানবাধিকার কর্মী এবং শিক্ষার্থী। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের চারজন বাদে সবাই ছিলেন গারো যারা পরবর্তীতে মধুপুর শালবন এলাকার গ্রামসমূহের উপর শতভাগ খানা জরিপের কাজে অংশ নেন। মধুপুর শালবন এলাকায় অবস্থিত গ্রামসমূহে বসবাসকারীদের অবস্থা সম্পর্কে কোনো বেজলাইন তথ্য-উপাত্ত না থাকায় সেখানকার মানুষদের উপর গুণগত ও সংখ্যাগত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে এ খানা জরিপ চালানোর পরিকল্পনা করা হয়। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদেরকে মাঠ গবেষণা, জরিপ, সাক্ষাৎকার, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি) এবং অনুসন্ধানের উপর দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। খানা জরিপের কাজে ব্যবহারের জন্য তৈরি লিখিত প্রশ্নমালাটি চূড়ান্ত করার পূর্বে অংশগ্রহণকারীদেরকে সে প্রশ্নমালা মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা করার জন্য পাঠানো হয়। এ প্রশিক্ষণে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং মধুপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (স্থানীয় প্রশাসন) উপস্থিত ছিলেন এবং তারা মধুপুর শালবনের ইতিহাস ও এর দ্রুত বিনাশ নিয়ে আলোচনা করেন। গারো এবং কোচ জনগোষ্ঠীর আদি নিবাস মধুপুর শালবন এলাকায় এখন গারো ও কোচদের চাইতে বাঙালিদের সংখ্যা অনেক বেশি। একসময়ের ঐতিহ্যবাহী মধুপুর শালবন কমে এখন তার প্রকৃত আয়তনের মাত্র ১২ শতাংশে নেমে এসেছে। (প্রকল্পের দ্বিতীয় বছর শালবন এলাকার ৪৪টি গ্রামে খানা জরিপ পরিচালিত হয়)।

কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীগণ।

যৌনকর্মীদের অধিকার এবং সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধির উপর আবাসিক কর্মশালা

ঢাকায় ২০-২২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তিনদিন ব্যাপী এ আবাসিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। যৌনপল্লীসমূহে (আটটি যৌনপল্লী থেকে) কর্মরত, ভাসমান যৌনকর্মী এবং যৌনকর্মীদের প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে ২০ জন এবং হিজড়া যৌনকর্মীদের থেকে দুইজনসহ মোট ২২ জন যৌনকর্মী প্রতিনিধি এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এ কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশের যৌনকর্মীদের বর্তমান অবস্থা ও যৌনকর্মীদের নিয়ে কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠান ও এগুলোর কার্যক্রম সম্পর্কে জানা, আধুনিক যৌন-দাসত্ব বিষয়ে জ্ঞান বা মতামত বিনিময় এবং যৌনকর্মীদের নিয়ে কর্মরত মানবাধিকার কর্মী ও অন্যান্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি।

এগারোটি যৌনপল্লীর উপর গুচ্ছ জরিপ এবং একক যৌনকর্মীর উপর জরিপ করার লক্ষে অংশগ্রহণকারীদেরকে কীভাবে সহজ ভাষায় নিজ জীবনের গল্প লিখতে হয়, মাঠ জরিপ এবং এফজিডি বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে যৌনপল্লী এবং একক যৌনকর্মীর উপর জরিপকাজে ব্যবহার করার জন্য দুটি আলাদা প্রশ্নমালা চূড়ান্ত করা হয়।

বেদে সর্দারদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর আবাসিক কর্মশালা

বেদে জনগোষ্ঠীর উপর জরিপের লক্ষ্যে ১৭-১৯ ডিসেম্বর ২০১৭ ঢাকায় বেদে সর্দর ও বেদেদের নিয়ে কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ে একটি আবাসিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বেদে সর্দার (বেদে বহর বা দলের নেতা), সাভার ও মুন্সীগঞ্জ এলাকার বেদে নেতা, বেদে জনগোষ্ঠীর কয়েকজন তরুণ প্রতিনিধি এবং একজন সাংবাদিকসহ মোট ২০ জন এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ এ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশে বেদে জনগোষ্ঠীর বর্তমান অবস্থার মানচিত্রায়ণ, অংশগ্রহণকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, তাদের আর্থ-সামাজিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং সমস্যা সমাধানের যথাযথ উপায় খোঁজা এ কর্মশালার মূল শিখন উদ্দেশ্য।

বেদেরা একটি ভাসমান জনগোষ্ঠী যাদের অনুমিত সংখ্যা আট লাখের মতো। এরা বছরের অধিকাংশ সময় দেশব্যাপী ঘুরে বেড়ায়। এ জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষ আগে ঘুরে বেড়াতো জলে (নৌকায়), এখন স্থলে (ডাঙ্গায়)। নিজেদের ঐতিহ্যবাহী জীবনযাপন বজায় রাখতে তাদেরকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং তাদের সন্তানদের অধিকাংশই নিরক্ষর।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা জানান, বর্তমানে বেদেদের জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজন শিক্ষা এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ। বেদেরা তাদের ঐতিহ্যগত পেশা (যেগুলো অতি দ্রুত সমাজে প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলছে) পরিবর্তন করতে চান। এর জন্য দরকার বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ। শিক্ষিত এবং মর্যাদাপূর্ণ কাজে জড়িত হতে পারলে বেদেরা নিজেদের মধ্যে প্রচলিত বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের চর্চা অনেকাংশেই কমিয়ে আনতে পারবে।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আদিবাসীদের সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি নিয়ে আবাসিক কর্মশালা

দিনাজপুরের পার্বতীপুরে ০৭-০৯ জানুয়ারি ২০১৮ এ আবাসিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত সাতটি প্রান্তিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর (সান্তাল, মুন্ডা, ওঁরাও, বাঁশফোর, রবিদাস, কোদা এবং ঋষি) ২৪ জন যুবক প্রতিনিধি এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় আদিবাসীদের প্রান্তিকতা, বিচ্ছিন্নতা, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। তাছাড়া বুদ্ধিবৃত্তিক স্বচ্ছতার গুরুত্ব এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আদিবাসীদের সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি সম্পর্কে কর্মশালায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিচ্ছিন্ন, প্রান্তিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি নিয়ে প্রশিক্ষণ

হরিজন (সুইপার), ঋষি, এবং কায়পুত্র (শুকর চড়ানো সম্প্রদায়) বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাসমূহে বসবাসকারী উল্লেখযোগ্য বিচ্ছিন্ন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। ১৫-১৭ জানুয়ারি ২০১৮ যশোরে অনুষ্ঠিত একটি আবাসিক কর্মশালায় এসব জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সমস্যা এবং বিষয় তুলে ধরা হয়। কায়পুত্র, হরিজন, ঋষি, মুন্ডা জনগোষ্ঠী এবং গণমাধ্যমের ২৪ জন প্রতিনিধি এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী ও তাদের প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তাদের নিয়ে কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলা এ কর্মশালার মূল শিখন উদ্দেশ্য।

দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতম এসব জনগোষ্ঠীর মানুষ চাকুরি, শিক্ষা, বাসস্থান এবং অন্যান্য মৌলিক সুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার। এদের অনেকে সামাজিকভাবে পরিত্যক্ত যাদেরকে 'অস্পৃশ্য' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মাঝেমধ্যে এরা শারীরিকভাবে নিগ্রহ হওয়াসহ অন্যান্য পাশবিকতা ও নির্মম আচরণের শিকার হন তারা।

বিহারি ও হরিজন জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা ও অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি বিষয়ে কর্মশালা

ঢাকায় ২৩-২৪ জানুয়ারি ২০১৮ এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বিহারিদের (আটকে পড়া পাকিস্তানি) অধিকার এবং দাবি-দাওয়া নিয়ে এডভোকেসি করা তাদের একমাত্র সংগঠন স্ট্র্যান্ডেড পাকিস্তানিজ জেনারেল রিপ্যাট্রিয়েশন কমিটি (এসপিজিআরসি) এবং হরিজন (সুইপার) জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে কর্মরত সংগঠন বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ-এর ২৫ জন প্রতিনিধি এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এ কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য তাদের (প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের) সাংগঠনিক সক্ষমতা এবং নেতৃত্ব দক্ষতা বৃদ্ধি করা যাতে তারা রাষ্ট্রের বিভিন্ন কার্যপ্রক্রিয়ায় নিজেদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে পারে। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করেন, বিশেষজ্ঞদের সাথে তাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাসমূহ শেয়ার করেন এবং তাদের সমস্যাসমূহ সমাধানকল্পে সুপারিশমাল তৈরি করেন।

"চা শিল্প ব্যতীত অন্য কোনো শিল্পের বেলায় সরকার নিজ খরচে ট্রেড ইউনিয়নের নির্বাচন করে দিয়েছে এমন ঘটনা সাম্প্রতিক ইতিহাসে নেই।"

— তপন দত্ত

"সরকার আমাদের নির্বাচন করে দিয়েছে কারণ আমরা এখনো নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এতো বড় একটি ইউনিয়নের নির্বাচন পরিচালনা করার সক্ষমতা অর্জন করতে পারিনি।"

— রামভজন কৈরী

চা বাগানে নির্বাচন এবং চা বাগানের বাধা শ্রমিকদের আরো গুরুতর বিষয়

ফিলিপ গাইন

গত ২৪ জুন ২০১৮-এ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন (বিসিএসইউ)-এর কেন্দ্রীয়, ভ্যালী এবং বাগান বা পঞ্চায়েত পর্যায়ের নির্বাচন ছিল চা শ্রমিকদের জন্য একটি আনন্দের দিন। বাংলাদেশের একক বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন বিসিএসইউ। এটি সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, চট্টগ্রাম এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার ১৬১টি চা বাগানে কর্মরত ৯৭,৬৪৬ জন ভোটারের (যারা সবাই বাগানের নিবন্ধিত শ্রমিক) একমাত্র ইউনিয়ন। চা শ্রমিকেরা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনের মাধ্যমে ১৯৪৮ সালে বিসিএসইউ প্রতিষ্ঠার পর এ নিয়ে তৃতীয়বার ভোট প্রদানের মাধ্যমে তাদের নেতৃত্ব নির্বাচন করেছে।

চা শ্রমিকেরা সর্বপ্রথম ২০০৮ সালে গোপন ব্যালটে ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে। তখন একজন চা শ্রমিকের দৈনিক নগদ মজুরি ছিল ৩২.৫০ টাকা। বিসিএসইউ-এর দ্বিতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১০ আগস্ট ২০১৪-এ, চা শ্রমিকের মজুরি তখন বেড়ে দাড়ায় ৬৫ টাকায়। দুটি নির্বাচনেই রামভজন কৈরী এবং মাখনলাল কর্মকারের প্যানেল নিরঙ্কুশভাবে বিজয় লাভ করে। এবারের নির্বাচনের ফলাফল একই (বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়)।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন শ্রম অধিদপ্তর বিসিএসইউ-এর পূর্ববর্তী দুটি নির্বাচনের ন্যায় তৃতীয় নির্বাচনও পরিচালনা করে দিয়েছে। নির্বাচন পরিচালনার জন্য গঠিত নয় সদস্যের নির্বাচন কমিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শিবনাথ রায় (অতিরিক্ত সচিব)। নির্বাচন কমিশন অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে এ নির্বাচন সম্পন্ন করেছে।

নির্বাচনের দিনটি ছিল চা শ্রমিকদের জন্য ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার। প্রায় ৯৭ শতাংশ ভোটার এ নির্বাচনে ভোট দিয়েছে এবং এর মাধ্যমে চা শ্রমিকেরা কোনো ধরনের সমস্যা ছাড়াই বিসিএসইউ-এর পঞ্চায়েত, সাতটি ভ্যালী কমিটি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্ব দেবার জন্য তাদের পছন্দের প্রার্থীদের নির্বাচিত করেছে।

বিসিএসইউ-এর কেন্দ্রীয় কমিটি ৩৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে আটজন চা শ্রমিকদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত (সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের প্যানেল), ২২ জন সাতটি ভ্যালির সভাপতি (অন্যান্য ভ্যালির তুলনায় বালিশিরা ভ্যালির আয়তন বড় হওয়ায় বালিশিরা ভ্যালি থেকে দুইজন), সহ-সভাপতি, সম্পাদক এবং সাংগঠনিক সম্পাদক (শুধুমাত্র বালিশিরা ভ্যালীতে) এবং পাঁচ জন পরাজিত সভাপতি ও সেক্রেটারির মনোনীত সদস্য। তৃতীয়বারের মতো বিসিএসইউ-এর সাধারণ সম্পাদক পদে পুনর্নির্বাচিত রামভজন কৈরী নির্বাচন নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তিনি ১৯৭০ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিসিএসইউ ও লেবার হাউজে অবস্থিত এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় নিয়ন্ত্রণে

নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর নির্বাচন কমিশনার শিবনাথ রায় (মাঝে), রামভজন কৈরী (তার ডানে) এবং মাখনলাল কর্মকার (বাঁয়ে)। ছবি: প্রসাদ সরকার

রাখা রাজেন্দ্র প্রসাদ বুনার্জি ও তার পছন্দের সমালোচিত কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে তরুণদের নেতৃত্বে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণায় সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। রাজেন্দ্র প্রসাদ বুনার্জির নেতৃত্বাধীন কমিটি বিসিএসইউ-এর নেতৃত্বে থাকাকালে বিসিএসইউ-এ কোনো গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি বলে অভিযোগ আছে। কৈরী বলেন, "চা শ্রমিকেরা এ নিয়ে তৃতীয়বার অধিকার আদায়ের সংগ্রামের পক্ষে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে।"

ট্রেড ইউনিয়ন নির্বাচন সম্পাদনে সরকারের সংশ্লিষ্টতা কেন?

শ্রম আইন ২০০৬ চা শিল্পকে একটি প্রতিষ্ঠানপুঞ্জ হিসেবে বিবেচনা করে এবং এ আইন চা শ্রমিকদেরকে শুধুমাত্র জাতীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন করার সুযোগ দিয়েছে। চা বাগানে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার জন্য মোট শ্রমিকের ৩০ শতাংশকে অবশ্যই ইউনিয়নের সদস্য হতে হয় (নির্বাচনের সময় এ বিধান ছিল)। যেহেতু বর্তমান ব্যবস্থায় সকল নিবন্ধিত চা শ্রমিক তাদের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র ইউনিয়নের (বিসিএসইউ) সদস্য হয়ে আছে, তাই চা বাগানে বর্তমান অবস্থায় দ্বিতীয় কোনো ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে বিসিএসইউ'র সাথে চা বাগানের বাইরের কোনো ইউনিয়ন, ফেডারেশন বা কনফেডারেশনের বিশেষ কোনো সম্পৃক্ততা বা যোগাযোগ নেই। চট্টগ্রাম ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি ও বিসিএসইউ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট তপন দত্ত বলেন, "চা শিল্প ব্যতীত অন্য কোনো শিল্পের বেলায় সরকার নিজ খরচে ট্রেড ইউনিয়নের নির্বাচন করে দিয়েছে এমন ঘটনা সাম্প্রতিক ইতিহাসে নেই।" তবে বিজয়ী রামভজন কৈরী এ বিষয়ে বলেন, "সরকার আমাদের নির্বাচন করে দিয়েছে কারণ আমরা এখনো নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এতো বড় একটি ইউনিয়নের নির্বাচন পরিচালনা করার সক্ষমতা অর্জন করতে পারিনি।"

ট্রেড ইউনিয়ন বিশেষজ্ঞ এবং বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ল অ্যান্ড লেবার স্টাডিজ (বিআইএলএস)-এর নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ মনে করেন চা বাগানের বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সরকার চা জনগোষ্ঠীর মানুষদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতেই পারে। তবে নির্বাচন করে দেওয়ার বিষয়ে তিনি দ্বিমত পোষণ করে বলেন, "সরকার নিজ খরচে চা শিল্প ছাড়া অন্য কোনো শিল্পের ট্রেড ইউনিয়ন নির্বাচন করে দিয়েছে এমন ঘটনা আমার জানা নেই।" এ বিষয়ে তিনি পরামর্শ দিতে গিয়ে বলেন, সমগ্র চা শিল্পের মানুষদের জন্য শুধুমাত্র একটি ইউনিয়ন কাম্য নয়। শ্রম আইনে চা শিল্পে বাগান পর্যায়ে না হলেও অন্তত ভ্যালী পর্যায়ে আলাদা ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের বিষয়টি থাকা উচিত। সারা দেশের ১৬১টি চা বাগান (পঞ্চগড় বাদে) সাতটি ভ্যালীতে বিভক্ত।

চা শ্রমিকদের বৃহত্তর বিষয়: বঞ্চনা

বিসিএসইউ-এর নির্বাচনের বাইরে যে বিষয়টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো চা শ্রমিকদের বঞ্চনা যার অবসান হওয়া উচিৎ। চা শিল্প এমন একটি শিল্প যেখানে কোনো শ্রমিক নিয়োগপত্র পান না এবং অবসর গ্রহণের পর বা চাকুরি শেষে পান না গ্রাচুইটি। অন্যান্য শিল্পের শ্রমিকেরা চাকুরিকালে নৈমিত্তিক ছুটির সুবিধা পেলেও চা শ্রমিকেরা তা পান না। চা শ্রমিকের বঞ্চনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে তাদের 'অন্যায্য' মজুরি—দৈনিক নগদ ১০২ টাকা (২০১৭'র জানুয়ারী মাস থেকে)।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে চা শ্রমিকেরা অপরিচিতই রয়ে গেছে। অনেকে চা শ্রমিকদেরকে ভিনদেশি হিসেবে দেখে। নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও চা শ্রমিকদের দূরবস্থা ও সম-অধিকারের বিষয়ে অনেকেই উদাসীন। চা বাগানের এসব দূরবস্থা মূলত বাগান মালিকদেরকে চা শ্রমিকদের উপর শোষণ চালিয়ে যাবার আদর্শ পরিবেশ করে দিয়েছে।

সরকার এবং দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের চা শ্রমিকদের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে। অভিযোগ আছে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং নীতিনির্ধারকরা চা শ্রমিকদের জন্য শ্রম আইনে উল্লেখিত বৈষম্যমূলক বিষয়াবলী দূর করতে যা করণীয় তা করছে না। এভাবেই রাষ্ট্র ও নীতিনির্ধারকেরা চা শ্রমিক সম্পর্কিত শ্রম আইনে উল্লিখিত বিষয়সমূহ যথাযথ বাস্তবায়ন না করে চা শ্রমিকদের দূরবস্থাকে টিকিয়ে রাখছে।

চা জনগোষ্ঠীর এসব বিচ্ছিন্ন মানুষ তাদের প্রকৃত ভাষার অনেক কিছুই হারিয়ে ফেলেছে এবং সেইসাথে হারিয়েছে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, শিক্ষা, জ্ঞান এবং একতা। চা জনগোষ্ঠীর এসব মানুষ রাষ্ট্রের বিশেষ মনোযোগ পাওয়ার দাবি রাখে। পাশাপাশি এরা দাবি রাখে নাগরিক হিসেবে সম-অধিকার পাওয়ার যা ২৪ জুন ২০১৮-এ অনুষ্ঠিত নির্বাচনের চাইতেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ডেইলি স্টার-এর ৩০ জুন ২০১৮ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত ❑

গবেষণা এবং জরিপ

এ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য বিচ্ছিন্ন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর গবেষণার সার-সংক্ষেপ এখানে প্রকাশিত হলো। এ নিউজলেটারের পূর্বের সংখ্যায় চা জনগোষ্ঠী, জলদাস এবং কায়পুত্র জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রকাশিত হয়েছে।

আদিবাসী

ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা আদিবাসীদেরকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়— স্বতন্ত্র এবং মিশ্র। স্বতন্ত্র (সুস্পষ্ট পরিচিতি সহকারে) জাতিগোষ্ঠীর উদাহরণ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী ১১টি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী এবং সমতলে বসবাসকারী সান্তাল, ওঁরাও, হাজং, খাসি, গারো এবং মণিপুরী জাতিগোষ্ঠী উল্লেখযোগ্য। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০-এ (দি স্মল এথনিক গ্রুপস কালচারাল ইন্সটিটিউশন অ্যাক্ট ২০১০) আদিবাসীদেরকে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী (অর্থাৎ ক্ষুদ্র জাতিসত্তা) নামে অভিহিত করা হয়েছে যেখানে মোট ২৭টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নাম উল্লেখ আছে।

এ আইনে তালিকাভুক্ত ২৭টি নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী মারমা ও মং একই জনগোষ্ঠীর মানুষ এবং সেইসাথে ত্রিপুরা ও উসাই বা উসুই জাতিগোষ্ঠীর মানুষও এক ও অভিন্ন। এছাড়াও সমতলের তালিকাভুক্ত মালপাহাড়ী ও পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর মানুষও এক। ফলে এই আইন অনুসারে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা আদিবাসীর সংখ্যা দাড়ায় ২৪-এ।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার উপর সেড-এর ব্যাপক ইনভেন্টরি (২০১৪-২০১৫ সালে পরিচালিত) অনুসারে, চা বাগান ও সরকারি হিসাবের বাইরে সমতলে আরো আছে ৩৭টি জাতিগোষ্ঠী। চা বাগান এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে আদিবাসী বা ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের বসবাস মূলত দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, উত্তর-মধ্যাঞ্চল এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকায়।

হরিজন

হরিজন (যারা দলিত নামেও পরিচিত) একটি পেশাজীবি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়। এরা ঐতিহ্যগতভাবে 'সুইপার' বলে পরিচিত। হিন্দু বর্ণাশ্রম বা জাতিভেদ প্রথা অনুসারে চারটি শ্রেণির বাইরে অর্থাৎ শুদ্রের নীচে যারা অবস্থান করেন তাদেরকে বুঝাতে ব্যবহার করা হয়। হরিজন জনগোষ্ঠীর মানুষ পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলা ব্যতীত বাংলাদেশের সকল জেলার সিটি করপোরেশন ও পৌরসভায় পরিচ্ছন্ন কর্মী হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ-এর তথ্যানুসারে বাংলাদেশে হরিজন জনগোষ্ঠীর অনুমিত সংখ্যা দশ থেকে পনের লাখের মতো। কিন্তু আসাদুজ্জামান তার *বই দি 'পারিয়া' পিপল: এন এথনোগ্রাফি অব দি আরবান সুইপারস ইন বাংলাদেশ* (২০০১)-এ হরিজনদের সংখ্যা মাত্র এক লাখের মতো বলে উল্লেখ করেছেন।

পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) এ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের ৩৭টি জেলার ৪৬টি হরিজন অধ্যুষিত সুপরিচিত 'সুইপার' বা হরিজন কলোনীতে গবেষণা করেছে। এসব কলোনীতে ৬,১০৩টি পরিবারে মোট ৩৯,০১৭ জন হরিজনের বসবাস। পিপিআরসি'র গবেষণা, মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধান এবং বিভিন্ন তথ্যসূত্র অনুসারে সারাদেশের শহরাঞ্চলে সুইপার বা পরিচ্ছন্ন কর্মী হিসেবে কর্মরত ও সবগুলো কলোনীতে বসবাসকারী হরিজন জনগোষ্ঠীর মানুষের মোট সংখ্যা হবে এক লাখের মতো, যা আসাদুজ্জামানের তথ্যকে সমর্থন করে।

ব্রিটিশ শাসকেরা ভারতের উড়িষ্যা, বিহার এবং উত্তর প্রদেশসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে হরিজনদেরকে বাংলাদেশে নিয়ে আসে। তাদেরকে তখন একটি সমৃদ্ধিশালী এলাকায় (তৎকালীন পূর্ববঙ্গ ও বর্তমানে বাংলাদেশ) নিয়ে ভালো চাকুরি, উন্নত বাসস্থান এবং স্বাস্থ্যসেবার দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। কিন্তু এসবের পরিবর্তে তাদেরকে এখানে এনে লাগানো হয় ঝাড়ু দেওয়া ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে। গত ২০০ বছরেরও অধিক সময় ধরে এ কাজই এসব মানুষের প্রধান পেশা।

বেদে

বেদে বাংলাদেশের একটি মুসলিম যাযাবর জনগোষ্ঠী। এরা বছরে দশ-এগারো মাস জীবিকার সন্ধানে দেশব্যাপী ঘুরে বেড়ায় এবং এক থেকে দুই মাস দেশের ৭৫টি স্থানে নিজেদের পরিবার-পরিজন ও সম্প্রদায়ের মানুষদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের জন্য মিলিত হয়। বিভিন্ন তথ্যসূত্র অনুসারে সারা দেশে বেদে জনগোষ্ঠীর অনুমিত সংখ্যা পাঁচ থেকে আট লাখের মতো। গ্রাম বাংলা উন্নয়ন কমিটির তথ্যমতে, প্রায় ৫,০০০ বেদে বহর (দল) সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ায়।

বেদেরা একটি ভাসমান জনগোষ্ঠী যাদের অধিকাংশই সম্পূর্ণ ভূমিহীন। বেদেদের মধ্যে পেশাভিত্তিক বিভিন্ন উপদল বা গোত্র রয়েছে। যেমন–মিরশিকারী বা ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসক (যারা ঝাড়ফুঁক করে ও তাবিজ বিক্রি করে), সাপুড়ে (যারা সাপ ধরে ও কেনাবেচা করে), কুরিন্দার বা ঝাঁই (যারা নদী থেকে স্বর্ণ অথবা হারানো জিনিসপত্র খুঁজে বের করে), বাজিগর (যারা জাদু দেখায়), সানদার (ফেরিওয়ালা যারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে চুড়ি, মালা ও অন্যান্য প্রসাধনী সামগ্রী বিক্রি করে) ইত্যাদি।

বেদেরা অত্যন্ত দরিদ্র এবং এদের মধ্যে সাক্ষরতার হার খুব কম। এরা খাস জমি ব্যবহার, স্বাস্থ্যসেবা, মৌলিক সরকারি সুবিধা, নিরাপত্তা-জাল কর্মসূচীসহ অন্যান্য সুবিধাদি ভোগ করার সুযোগ খুব কমই পায়। মূলত সাক্ষরতার হার কম হওয়ায় বেদেদের মধ্যে বাল্যবিবাহ এবং কুসংস্কারে বিশ্বাস বেশি। ২০০৮ সালে বেদেরা ভোট দেবার অধিকার পায়।

পিপিআরসি দেশের আটটি জেলার ১৪টি সুপরিচিত বেদে পল্লীতে গবেষণা পরিচালনা করেছে যেখানে মোট ৫৫,৪০৮ জন বেদে পাওয়া গেছে।

যৌনকর্মী

বাংলাদেশের টাঙ্গাইল, জামালপুর, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, যশোর, বাগেরহাট এবং পটুয়াখালী জেলার ১১টি যৌনপল্লীতে একটি নির্দিষ্ট সময়কালে (২০১৭-২০১৮) কাজ করছে ৪,০০০-এর মতো নারী যৌনকর্মী। তবে দেশে

শারিরীকভাবে নির্যাতিত এক যৌনকর্মী।

মোট নারী যৌনকর্মীর সংখ্যা প্রায় ৯৫,০০০ যা যৌনপল্লীগুলোতে কর্মরত নারী যৌনকর্মীর সংখ্যা থেকে অনেক বেশি। বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুসারে (২০১৬), এসব মহিলা যৌনকর্মীর (প্রায় ৯৫,০০০) মধ্যে ৩৬,৫৯৩ জন রাস্তায়, ৩৬,৫৩৯ জন বাসা-বাড়ীতে এবং ১৫,৯৬০ জন হোটেলে কাজ করে। এর পাশাপাশি ১০,০০০ -এর মতো হিজড়া যৌনকর্মের সাথে জড়িত।

সেড ২০১৭-২০১৮ সালে যৌনকর্মীদের বর্তমান অবস্থা বিশেষত তাদের প্রয়োজন ও সমস্যা বিষয়ে জরিপ করেছে। জরিপকালে সেড-এর জরিপদল ১১টি যৌনপল্লীতে গুচ্ছ জরিপের পাশাপাশি বিভিন্ন যৌনপল্লী ও রাস্তায় কাজ করা বিভিন্ন বয়সী ১৪০ জন যৌনকর্মীর (হিজরা সহ) নিবিড় সাক্ষাৎকার নিয়েছে। এ নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশিত হবে।

বিহারি

উর্দুভাষী বিহারি জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের ৫১টি জেলার ৭০টি ক্যাম্পে বসবাস করে। বাংলাদেশে বসবাসকারী অধিকাংশ মুসলমান

বিহারির আদি নিবাস ভারতের বিহার রাজ্য। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় বিহারিরা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশ) চলে আসে। তবে মুসলমান বিহারিদের কিছু অংশ এখনও ভারত ও পাকিস্তানে বসবাস করছে।

২০০৮ সালের ১৯ মে পর্যন্ত বিহারিরা ছিল রাষ্ট্রহীন। এদিন হাইকোর্ট এক রায়ে ১৫০,০০০ বিহারি শরণার্থীকে নাগরিকত্ব প্রদান করে। এরা ১৯৭১ সালে নাবালক ছিল বা পরবর্তীতে জন্ম নেয়। তবে নাগরিকত্ব পেলেও বিহারিরা স্থায়ী ঠিকানা ও মৌলিক সুযোগ-সুবিধা ছাড়া এদেশের ক্যাম্পগুলোতে মানবেতর জীবনযাপন করছে। এরা প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হচ্ছে তাদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার হতে।

একটি তথ্যসূত্র অনুসারে বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের পরপর নির্মিত ক্যাম্পগুলোতে ১৯৭২ সালে বিহারি বসবাসকারীদের সংখ্যা ছিল ৭৩৫,১৮০। তবে ১৯৭৩ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৭৮,০৬৯ জন বিহারি পাকিস্তানে প্রত্যাবাসিত হয়ে চলে যাওয়ায় এদেশে বিহারিদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসে। পিপিআরসি দেশের ১৩টি জেলার বিহারি অধ্যুষিত ৩০টি সুপরিচিত বিহারি ক্যাম্প ও বসতিতে গবেষণা পরিচালনা করেছে। গবেষণায় ৩০টি ক্যাম্প ও বসতিতে ২৬৫,৫৩১ জন বিহারি পাওয়া গেছে।

ঋষি

বঙ্গের ঋষি জনগোষ্ঠী বংশ পরম্পরায় চর্মকার, চামড়া শ্রমিক এবং বাদক। এদেরকে মুচি, চামার বা চর্মকার নামে চিহ্নিত করা হয়। এসব শব্দ ঋষিদের কাছে চরম অসম্মানজনক। বাংলা ভাষায় সাধারণত মুচি ও চামার শব্দ দ্বারা চামড়ার কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, জুতা প্রস্তুত ও মেরামতকারক বা মুচি, চর্মকার এবং চর্মশিল্পীদেরকে বুঝায়। হরিজনদেরকে হিন্দু সমাজের বৃহত্তম অস্পৃশ্য বা 'দলিত' জনগোষ্ঠীসমূহের একটি হিসেবে দেখা হয় (জশুয়া প্রজেক্ট ২০১৮)।

তবে ঋষিসহ 'অস্পৃশ্য' মানুষদের অনেকেই নিজেদের একটি চরম রাজনৈতিক শব্দ 'দলিত' বলে পরিচয় দেয় যার অর্থ হচ্ছে শোষিত, পদদলিত বা নিগৃহীত। বর্তমানে ঋষিদের অধিকাংশই তাদের ঐতিহ্যবাহী পেশা চামড়া ও জুতা তৈরির কাজ ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু পেশা পরিবর্তন করলেও এরা দলিত নামেই পরিচিত থেকে গেছে এবং শিকার হচ্ছে বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বঞ্চনা ও বৈষম্যের।

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় ঋষি জনগোষ্ঠীর মানুষের বসবাস রয়েছে। তারমধ্যে যশোর, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট এবং খুলনা জেলায় এদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। পিপিআরসি খুলনা বিভাগের সাতক্ষীরা, যশোর, খুলনা এবং বাগেরহাট জেলার ঋষি অধ্যুষিত ৫৩টি পাড়া বা গ্রামে গবেষণা পরিচালনা করেছে। গবেষণায় এসব ঋষি পাড়া বা গ্রামে ৯,০৮৮টি ঋষি পরিবারে ৫১,৭৪৫ জন ঋষি পাওয়া গেছে।

টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর শালবন এলাকার গ্রামসমূহের উপর খানা জরিপ

বাংলাদেশের উত্তর-মধ্যাঞ্চলের জেলা টাঙ্গাইলের মধুপুর শাল বন এলাকার ৪৪টি গ্রামে বসবাসকারী ১১,০৪৮ পরিবারের ৪৭,০৩৩ জনের উপর সেড জরিপ করেছে। এদের ৩৫.৩৯ শতাংশ গারো। একসময় মধুপুর শালবন এলাকার গ্রামসমূহের অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল গারো এবং কোচ জাতিগোষ্ঠীর মানুষ যারা এদেশে বসবাসকারী দুটি বৈচিত্র্যপূর্ণ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় এক সময় এসব গ্রামে কোনো বাঙালির বসবাস ছিলনা।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এসব গ্রামের মাত্র ১৩ শতাংশ বাঙালি এবং ৪.২ শতাংশ গারো পরিবারের বসতভিটার সিএস

অথবা আরওআর (দলিল) আছে। উঁচু জমি যেখানে কলা, আনারস, মসলা এবং অন্যান্য ফসলের চাষ হয় সেসবের দলিল আছে মাত্র ৪.৮ শতাংশ বাঙালি এবং ২.৬ শতাংশ গারো পরিবারের। আর নীচু জমির দলিল আছে ৯.৭ শতাংশ বাঙালি এবং ১১.২ শতাংশ গারো পরিবারের।

বনবিভাগ কর্তৃক দায়ের করা বন মামলা মধুপুর শালবনে বসবাসকারী মানুষের জন্য একটি বড় উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তার বিষয়। জরিপকৃত ৪৪টি গ্রামে বন মামলা পাওয়া গেছে ৩,০২৯টি। শুধুমাত্র মধুপুরে বন মামলার সংখ্যা সাড়ে চার হাজারের মতো যা সমগ্র টাঙ্গাইল জেলার মোট বন মামলার ৯০ শতাংশ।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সময়ে মধুপুর শালবন ছিল নাটোরের রাজার অধীনে। তখন বনাঞ্চলের আদি অধিবাসী গারো, কোচ এবং অন্যরা স্বাধীনভাবে বনের জমি ব্যবহার করতো এবং বিনিময়ে রাজাকে খাজনা প্রদান করতো। কিন্তু অরণ্যচারী এসব মানুষ অন্যদের থেকে বরাবর বিচ্ছিন্ন থাকায় ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটলেও রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫০)-এ প্রদত্ত সুবিধা কাজে লাগাতে পারেনি। পরবর্তী সময়ে বন সংরক্ষণের নিমিত্তে বনের মালিকানা ন্যস্ত হয় বনবিভাগের নিকট এবং এর মাধ্যমে জমির উপর বনের আদি অধিবাসীদের স্বত্ত্বদখলীয় অধিকার অমীমাংসিত থেকে যায়। এসবই মূলত মধুপুর শালবনে চলমান ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মূল কারণ। ❑

সাবরিনা মিতি গাইন এবং ফিলিপ গাইন।
ছবি: ফিলিপ গাইন

আমার মাটি আমার মা

চা শ্রমিকের ভূমির অধিকার রক্ষার আন্দোলন

১৬০টি চা বাগানের (পঞ্চগড় বাদে) জন্য বরাদ্দ সরকারি জমি: ১১৩,৬৬৩.৮৭ হেক্টর
চা চাষের আওতাধীন জমি (২০১৪): ৫৮,০৯৫.৬০ হেক্টর
অবকাঠামো (লেবার লাইনসহ): ৯,৩১৫.০৪ হেক্টর
ধানি জমি বা ক্ষেতল্যান্ড: ১২,১৩৪.২৯ হেক্টর
চায়ের জন্য বরাদ্দ জমিতে রাবার চাষ: ৯,৩৭৮.২১ হেক্টর
প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম বন: ১০,১৫৯.০৮ হেক্টর
বাঁশ ও শন: ৫,২৬৭.০৮ হেক্টর ও অন্যান্য ফসল: ১,০৬৮.১০ হেক্টর
পতিত জমি, জলাশয় ও পুকুর: ৬,৫৬০.৪ হেক্টর এবং অন্যান্য জমি: ৫৬৪.৭০ হেক্টর
চা চাষের জন্য উপযোগী জমি: ৭,১৪২.৬৮ হেক্টর। সূত্র: বাংলাদেশ চা বোর্ড, ২০১৫

চা শ্রমিকের কাছে চা বাগানের ফাঁকে ফাঁকে ধানি জমি বা ক্ষেতল্যান্ড স্বর্ণতুল্য। জমির মালিক রাষ্ট্র। যেকোনো সময় এ জমি সরকার নিয়েও নিতে পারে। তবে দেড়শো বছর ধরে চা শ্রমিকরাই এ জমি চাষের উপযোগী করেছে এবং এ জমি রক্ষার জন্য তারা জীবন দিতে প্রস্তুত। হবিগঞ্জ জেলার চান্দপুর চা বাগানের ৫১১ একর ধানি জমি অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য সরকার বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তর করেছে। কিন্তু জমির দখল নিতে এলে চা শ্রমিকরা ২০১৫ সালের ডিসেম্বর ও ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে সরকারি সংস্থার সকল চেষ্টা রুখে দেয়। তাদের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত হয় "আমার মাটি আমার মা কেঁড়ে নিতে দেব না" এই শ্লোগানসহ আরো নানা প্রতিজ্ঞায়। দেশের নাগরিক সমাজ তাদের প্রতিরোধ আন্দোলনে সমর্থন দিয়েছে। আপাতত বন্ধ আছে অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ার কাজ। চা শ্রমিকদের দাবি সরকার ধানি জমি ও বসতভিটা তাদের নামে স্থায়ী বন্দোবস্ত দিক।

যোগাযোগ
সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)
গ্রীন ভ্যালী, ১৪৭/১ গ্রীন রোড (৩য় তলা), ফ্ল্যাট নং. ২এ, ঢাকা-১২১৫
ফোন: [illegible], ই-মেইল: sehd@sehd.org, philip.gain@gmail.com www.sehd.org

This project is funded by the European Union

Leaving No One Behind

Convention on Social, Economic and Political Protection of Marginal and Excluded Communities

22-23 November 2018 Sreemangal

Organized by
Society for Environment and Human Development (SEHD), Power and Participation Research Centre (PPRC), Christian Commission for Development in Bangladesh (CCDB) and Gram Bikash Kendra (GBK)

This project is funded by the European Union and ICCO COOPERATION

The Project

Society for Environment and Human Development (SEHD), Power and Participation Research Centre (PPRC), Christian Commission for Development in Bangladesh (CCDB) and Gram Bikash Kendra (GBK), with support from the European Union and ICCO COOPERATION, have been implementing the multi-year initiative, 'Defining the excluded groups, mapping their current status, strengthening their capacity and partnerships' since February 2016. The key objective of the initiativeis is to make the marginal and excluded communities in Bangladesh visible and address the challenges they face.

সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৮

অনুষ্ঠানসূচি

২২ নভেম্বর ২০১৮ (বৃহস্পতিবার)

০৮:৩০ *নিবন্ধন এবং অতিথি ও অংশগ্রহণকারীদের বরণ*

১০:০০ চা বিরতি

উদ্বোধনী পর্ব

১০:৩০ *স্বাগত বক্তব্য:* ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, নির্বাহী চেয়ারম্যান, পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি)

১০:৪০ *মূল প্রবন্ধ:* প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুরক্ষা

—ফিলিপ গাইন, পরিচালক, সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)

১১:০০ *সম্মানিত অতিথি ও বক্তা*

রামভজন কৈরী, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন (বিসিএসইউ); অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, উপাচার্য, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি; অধ্যাপক আহমেদ কামাল, ইতিহাসবিদ; মো: তোফায়েল ইসলাম, জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মৌলভীবাজার; ড. হরিশংকর জলদাস, বিশিষ্ট লেখক; সুলেখা ম্রং, সভাপতি, আচিক মিচিক সোসাইটি; মো: আব্দুল আউয়াল, ভাইস-চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টি এসোসিয়েশন (বিটিএ); ড. মো: আবদুল ওয়াজেদ, প্রাক্তন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; মোয়াজ্জেম হোসেন, প্রধান নির্বাহী, গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)

১২:৪০ *প্রধান অতিথি:* অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ

১২:৫৫ সভাপতি: ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, নির্বাহী চেয়ারম্যান, পিপিআরসি

০১:১৫ দুপুরের খাবার

০২:১৫ ***সমান্তরাল অধিবেশন: এক***

***আলোচ্য বিষয়:* চা জনগোষ্ঠী, আদিবাসী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পরিচয়, ভাষা এবং সংস্কৃতি**

সভাপতি: এ কে শেরাম, গবেষক, লেখক এবং কবি

সঞ্চালক: ফিলিপ গাইন, পরিচালক, সেড

নির্ধারিত আলোচক: অধ্যাপক ড. সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ (সৌরভ সিকদার), ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. হরিশংকর জলদাস, বিশিষ্ট লেখক; এবং মো: আলমগীর হোসেন, উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

মুক্ত আলোচনা

সমান্তরাল অধিবেশন: দুই

***আলোচ্য বিষয়:* চা জনগোষ্ঠী, আদিবাসী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভূমির অধিকার**

সভাপতি: ডেভিড হিলটন, সহযোগী পরিচালক, খ্রিস্টিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (সিসিডিবি)

সঞ্চালক: জিডিসন প্রধান সুচিয়াং, সভাপতি, খাসি সোশ্যাল কাউন্সিল

নির্ধারিত আলোচক: মোহাম্মদ আশরাফুল আলম খান (উপসচিব), এডিসি (রাজস্ব), মৌলভীবাজার; পিডিসন প্রধান সুচিয়াং, সভাপতি, বৃহত্তর সিলেট আদিবাসী ফোরাম; নৃপেন পাল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন (বিসিএসইউ); রমজান আহমেদ, বেদে নেতা; এবং অজয় এ মৃ, সভাপতি, আদিবাসী কালচারাল ডেভেলপমেন্ট ফোরাম

মুক্ত আলোচনা

সমান্তরাল অধিবেশন: তিন

***আলোচ্য বিষয়:* শ্রম আইন এবং বিটিএ ও বিসিএসইউ-এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি, এসবের বাস্তবায়ন এবং চা শ্রমিকদের জন্য শ্রম আইন সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা**

সভাপতি: তপন দত্ত, সভাপতি, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, চট্টগ্রাম

সঞ্চালক: বিজয় বুনার্জি, চা শ্রমিক নেতা এবং চেয়ারম্যান, রাজঘাট ইউনিয়ন পরিষদ

নির্ধারিত আলোচক: রামভজন কৈরী, সাধারণ সম্পাদক, বিসিএসইউ; মো: নাহিদুল ইসলাম, উপ-পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, শ্রীমঙ্গল; মো: ইউসুফ আলী, উপ-মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রীমঙ্গল; এবং উত্তম কুমার দাস, এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এবং প্রোগ্রাম অফিসার, আইএলও বাংলাদেশ

মুক্ত আলোচনা

০৪:০০ চা বিরতি

০৪:৩০ তথ্যচিত্র প্রদর্শন

০৫:৩০ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

সূচনা বক্তব্য: পরিমল সিং বাড়াইক, সভাপতি, বাংলাদেশ চা জনগোষ্ঠী আদিবাসী ফ্রন্ট

অতিথি বক্তা: ড. মাসুদুল হক, দিনাজপুর সরকারি কলেজ

আলোচ্য বিষয়: আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি

সাংস্কৃতিক পরিবেশনা: খাসি, মণিপুরী, শব্দকর, পথিক থিয়েটার, মুন্ডা ও তেলেগু সাংস্কৃতিক দল (*সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের স্থান: মহসিন অডিটরিয়াম*)

২৩ নভেম্বর ২০১৮ (শুক্রবার)

০৯:০০ *সমান্তরাল অধিবেশন: চার*

আলোচ্য বিষয়: টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে চা বাগানের মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সংলাপ ও ঐক্য

সভাপতি এবং সঞ্চালক: ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, নির্বাহী চেয়ারম্যান, পিপিআরসি

নির্ধারিত আলোচক: তপন দত্ত, সভাপতি, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, চট্টগ্রাম; রামভজন কৈরী, সাধারণ সম্পাদক, বিসিএসইউ; ড. কাজী মোজাফর আহম্মদ, সেক্রেটারি, বাংলাদেশ টি এসোসিয়েশন (বিটিএ); বিজয় বুনার্জি, চা শ্রমিক নেতা এবং চেয়ারম্যান, রাজঘাট ইউনিয়ন পরিষদ; এবং মো: আজিজুল ইসলাম, সাবেক উপ-মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুক্ত আলোচনা

সমান্তরাল অধিবেশন: পাঁচ

আলোচ্য বিষয়: আন্তর্জাতিক সনদ এবং জাতীয় আইন

সভাপতি: মোয়াজ্জেম হোসেন, প্রধান নির্বাহী, জিবিকে

সঞ্চালক: ভূপেশ রায়, হেড অব সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট, জিবিকে

আলোচক: ড. তানজিমুদ্দিন খান, সহযোগী অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সারওয়াত শামীন, লেকচারার, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; এবং ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া, আইনজীবী, সুপ্রিম কোর্ট

মুক্ত আলোচনা

সমান্তরাল অধিবেশন: ছয়

আলোচ্য বিষয়: বেদে, যৌনকর্মী, ঋষি এবং আরো কিছু জাতিসত্তার (মুন্ডা, শব্দকর, পাত্র ইত্যাদি) বিষয়

সভাপতি: সিলভেস্টার হালদার, হেড অব স্পেশাল প্রোগ্রামস অ্যান্ড এইচআরএমডি, সিসিডিবি

সঞ্চালক: ইউজিন নকরেক, সভাপতি, জয়েনশাহী আদিবাসী উন্নয়ন পরিষদ

নির্ধারিত *আলোচক:* মিলন দাস, নির্বাহী পরিচালক, পরিত্রাণ; সৌদ খান, বেদে সর্দার; নির্মল চন্দ্র দাস, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ; এবং আলেয়া আক্তার লিলি, সাধারণ সম্পাদক, সেক্স ওয়াকার্স নেটওয়ার্ক

মুক্ত আলোচনা

১১:০০ চা বিরতি

১১:৩০ *সমান্তরাল অধিবেশন: সাত*

আলোচ্য বিষয়: চা জনগোষ্ঠী, বেদে ও হরিজনদের প্রজনন ও স্বাস্থ্য অধিকার

সভাপতি: ডা. সত্যনারায়ণ ডোরাসওয়ামি, প্রধান, স্বাস্থ্য, জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ)

সঞ্চালক: মো: সামসুজ্জামান, প্রজেক্ট টেকনিক্যাল অফিসার, রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ (আরএইচ), জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ)

নির্ধারিত আলোচক: ডা. মো: জয়নাল আবেদীন টিটো, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, শ্রীমঙ্গল; গীতা গোস্বামী, সাবেক সহকারী সাধারণ সম্পাদক, বিসিএসইউ; ডা. নিবাস চন্দ্র পাল, সিনিয়র মেডিকেল অফিসার, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, শ্রীমঙ্গল; ইমরুল কায়েস মনিরুজ্জামান, পরিচালক, ফান্ড রেইজিং অ্যান্ড লার্নিং, ওয়াটার এইড বাংলাদেশ; এবং সারা মারান্ডি, নির্বাহী পরিচালক, আমাদের ফাউন্ডেশন

মুক্ত আলোচনা

সমান্তরাল অধিবেশন: আট

আলোচ্য বিষয়: প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সুরক্ষায় কর্মকৌশল নির্ধারণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি

সভাপতি: ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, নির্বাহী চেয়ারম্যান, পিপিআরসি

পূর্ববর্তী আলোচনাসমূহ থেকে তৈরি প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীসমূহের সুরক্ষা সংক্রান্ত কর্মকৌশল ও সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক খসড়া পেপার উপস্থাপন—ফিলিপ গাইন, পরিচালক, সেড

আলোচক: নজরুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শ্রীমঙ্গল; মোয়াজ্জেম হোসেন, প্রধান নির্বাহী, জিবিকে; সিলভেস্টার হালদার, সিসিডিবি; এবং পঙ্কজ কন্দ, সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন

০১:০০ দুপুরের খাবার

০২:১৫ *সমাপনী অধিবেশন:* **সমান্তরাল অধিবেশনসমূহের রিপোর্ট পর্যালোচনা**

সভাপতি: ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, নির্বাহী চেয়ারম্যান, পিপিআরসি

সম্মানিত অতিথি: রণধীর কুমার দেব, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, শ্রীমঙ্গল এবং মাখনলাল কর্মকার, সভাপতি, বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন (বিসিএসইউ)

সমান্তরাল অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের রিপোর্ট উপস্থাপন এবং সম্মেলনের লক্ষ্য অর্জনে অংশগ্রহণকারীদের অধিকতর আলোচনা

০৪:০০ চা বিরতি

০৫:০০ *সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা*

সূচনা বক্তব্য: ধীরেন্দ্র সিংহ থঙাম, সহ-সভাপতি, বৃহত্তর সিলেট আদিবাসী ফোরাম

অতিথি বক্তা: এ কে শেরাম, গবেষক, লেখক এবং কবি

আলোচ্য বিষয়: বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি

সাংস্কৃতিক পরিবেশনা: মণিপুরী, সাঁওতাল, ওঁরাও, ত্রিপুরা, এবং উড়িয়া সাংস্কৃতিক দল। (*সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের স্থান: মহসিন অডিটরিয়াম*)